1.পত্র কাব্য হিসাবে বীরাঙ্গনার সার্থকতা লেখো।

DR. MRINAL BIRBANSHI, HOD, DEPARTMENT OF BENGALI
VIJAYGARH JYOTISH RAY COLLEGE, KOLKATA

বাংলা কাব্যের নবজাগরণের সার্থক রূপকার কবিপুরুষ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, মঙ্গলকাব্যের ধীরপ্রবাহী ধারাটি ভেঙে দিয়ে নব আবেগ স্পন্দিত, প্রাণ প্রবুদ্ধ অমিত্রাক্ষর ছন্দের উদ্ভাবনে যে নতুন যুগের সৃষ্টি করেছিলেন তার প্রথম পদক্ষেপে ছিল 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য'। তারপরেই সৃষ্টি করলেন ওজঃশক্তি সম্পন্ন 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা ভাষা যে এত বীরত্বব্যঞ্জক হতে পারে, ললিত কলানিধির মধ্যে যে এত বীররস সঞ্চারিত ছিল, বস্তুত মেঘনাদবধ কাব্যের আগে তা বাঙালী সাহিত্য রসিকদের চিন্তাতেও ছিল না। এই ছন্দ এই কাব্য সৃষ্টি করে তিনি যেন নতুন প্রাণের সঞ্চার করলেন, বাংলা ভাষাকে এগিয়ে দিলেন অন্ধকারের যুগ থেকে আলোক উদ্ভাসে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে শুধুমাত্র উদ্দীপন বিভাব সঞ্জাত কাব্যই রচনা করেন নি। ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মতো পেলব কোমল কাব্য রচনাও তিনি করেছেন এবং সর্বোপরি এই কঠিন কোমল ভাবের সংমিশ্রণে তিনি সৃষ্টি করলেন তার অনবদ্য বীরাঙ্গনা কাব্য।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও শেষ পত্রকাব্য বীরাঙ্গনা। গঠন কৌশলের বিচারে কাব্যটি রোমন কবি ওভিদের রচিত কাব্য হিরোইডস এর কাছে ঋণী। কবি স্বয়ং তাঁর পত্রে এই অনুসৃতির কথা স্বীকার করেছেন। ওভিদের অনুসরণে কবিও তার কাব্যকে ২১টি পত্রে সমাপ্ত করতে চেয়েছিলেন, তার পত্রে এই বাসনার উল্লেখ আছে। হিরোইডস-এর সাথে বহিরঙ্গ- গত সাদৃশ্য থাকলেও বীরাঙ্গনা মধুর একান্ত মৌলিক রচনা। ড. ক্ষেত্রগুপ্ত এ প্রসঙ্গে বলেছেন—"কিন্তু পত্রাকারে রচিত হলেও মধুসূদনের কবিমন নাট্যধর্ম ও গীতোচ্ছ্বাস আর আখ্যান অংশের সংযোগে এক নবতর আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন" (মধুসূদন কবিআত্মা ও কাব্যজিজ্ঞাসা) পৃথিবীর সকল দেশেই সর্বকালে সাহিত্য বিবিধ আঙ্গিককে অবলম্বন করে রচিত হয়ে থাকে। একসময়ে চিঠির ঢঙে কবিতা লেখারও প্রচলন হয় যার অন্যতম নিদর্শন ওভিদের কাব্য আমাদের সংস্কৃত সাহিত্যেও 'মেঘদূত' কাব্য পাঠ করলে মনে হয় মেঘকে দূত হিসাবে সম্বোধন করে বিরহী যক্ষ তার নিভৃত সংলাপগুলি যেন পত্রলেখকের মতোই উচ্চারণ করছেন। তবে মধুর বীরাঙ্গনায় সংস্কৃত কবিদের তেমন প্রভাব চোখে পড়ে না। এইকাব্য রচনায় মধুমূলত ওভিদের কাব্যকেই আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন।

পত্রকাব্যে রচনার কিছু শর্ত আছে। সাহিত্যের এই বিশেষ আঙ্গিকটি বিচারের প্রধান মানদণ্ড হল পত্রলেখকের সঙ্গে প্রাপকের সম্পর্ক ও পারস্পরিক স্বচ্ছতা। পত্রকাব্যে লেখকের মনের গোপন কথাটির সন্ধান মেলে। তবে পত্রকাব্যে তা নিহিত থাকে পরোক্ষভাবে। অপ্রাসঙ্গিক বিষয় অবতারণা বা বাকঅনাড়ম্বর পত্রকাব্যে কাম্য নয় পত্রকাব্যের কবিকে সর্বদা সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয় যাতে পাণ্ডিত্যের ভারে চিঠির অন্তর্নিহিত অন্তরঙ্গতার সহজরস বিনষ্ট না হয়।

এদিক থেকে বিচার করলে বীরাঙ্গনার পত্রগুলিকে অবশ্যই পত্রকাব্য বা Epistolary Verse বলা যায় । এই কাব্যের প্রতিটি পত্রই পৌরাণিক নারীদের ঈপ্সিত প্রেমাস্পদের কাছে না বলা কথা বা হৃদয়াবেগের উদাহরণ। তা কখনও অনুরাগ কখনও বা অনুযোগও।

বৃহস্পতির পত্নী তার সকল নীতিধর্ম বিসর্জন দিয়ে প্রণয় পত্র রচনা করেছেন স্বামী শিষ্য সোমদেবের উদ্দেশ্যে। গুরুগৃহে বাসকালে প্রতিদিনের কর্মের মাঝে কেমন করে তারার হৃদয় আপনাকে তুলে ধরেছে, পূর্বরাগের সেই কাহিনি তারার পত্রের পটভূমি। গুরুপত্নী হিসাবে তারার এই প্রণয় নিবেদন পুরাণসিদ্ধ না হলেও পত্রের আঙ্গিকেই তা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে আধুনিক পাঠকের কাছে। পত্রের শেষে তারা লিখেছেন—

“কি আর কহিব
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে।”

কেকয়ীর পত্রটি ভিন্ন প্রকৃতির নাট্য চাতুর্য্যের মুন্সীয়ানায় রচিত। নায়িকার হৃদয়ের ঈর্ষা দ্বেষ-জ্বালা বাইরের ব্যঙ্গের আবরণে আবৃত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে পত্রটিতে। একে তাই অনুযোগ পত্রিকা বলা চলে। ভরতকে বাদ দিয়ে রামচন্দ্রের জন্য যৌবরাজ্যে অভিষেকের ব্যবস্থায় ক্ষুব্ধ কেকয়ী তার বক্তব্যের অস্তিমে অভিমান দগ্ধ কণ্ঠে জানিয়েছেন, তিনি সন্দিপতিব্রতা হন তবে—

“বিচার করুণ ধর্ম্ম, ধর্ম্ম রীতি মতে”।

কেকয়ীর ব্যক্তিগত অভিসন্ধির বাহন হিসাবে পত্রের আঙ্গিককে সাথকরূপে ব্যবহার করেছেন মধুসূদন।

প্রোষিতভর্তৃকা পাঞ্চালীর স্বামী পার্থের সঙ্গে কুশল বিনিময় করছেন 'অর্জুনের প্রতি দ্রৌপদীর পত্রে'। প্রেমরসের বিচিত্র রহস্য উদ্ঘাটনে কবি ব্রতী হয়েছেন বীরাঙ্গনা কাব্যে, দ্রৌপদীর পত্রিকায় বৈপরীত্যবোধ তাকে একটি বিশেষ দিকে আলোকিত করে তোলে। অস্ত্রশিক্ষার্থে সুরপুরে অবস্থিত অর্জুনের জন্য বিরহ আপ্লুতা দ্রৌপদী তার দ্রুত আগমন প্রার্থনার সাথে সাথে স্মরণ করেছেন অতীতের স্মৃতিময় দিনগুলি—

“কে ফেরে বিদেশে
যুবতী পত্নীরে ঘরে রাখি একাকিনী”।

অনুযোগের সুরে ব্যক্তিগত হৃদয়োত্তাপের এক প্রতিবাদী ভঙ্গির প্রকাশ ধ্বনিত হয়েছে নীলধ্বজকে লিখিত জনার পত্রিকাতে। আলোচ্য কাব্যের এটাই একটি মাত্র পত্র যেখানে কবি এমন এক নারী মূর্তি রচনা করেছেন যে মূর্তি প্রেমিকার নয়, কিন্তু আপন মহিমায় ভাস্বর। জনার বাৎসল্য তার সুতীব্র

আত্মমর্যাদার উদ্বোধক রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। পুত্রের মৃত্যুর বেদনাকে একমাত্র নারীর গৌরববোধের মধ্যে নির্বাচিত করেছেন জনা। পুত্রের ব্যক্ত তীব্র শ্লেষের মাধ্যমে এক্ষেত্রে নায়িকার আবেগ বা অভিনয় নয় ব্যক্তিগত রোষের উৎসারণ ঘটেছে।

আবার দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলার পত্রেও মধুর মিলনের অতীত স্মৃতি ও নস্টালজিক কোলাজ সার্থকরূপে ভাস্বর হয়ে উঠেছে পত্রকাব্যের আঙ্গিকে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আখ্যায়িকার বিন্যাস, নাট্যচমৎকারীত্ব ও গীতিকাব্যের মূর্ছনায় নায়িকাদের বক্তব্যগুলি শিল্পমূল্যে অভিষিক্ত হয়েছে বীরাঙ্গনার পত্রকাব্যগুলিতে। শুধু তাই নয় মনন ও আবেগ যেন এক ঐক্যবদ্ধ সূক্ষ্ম পরিণতি লাভ করেছে পত্রকাব্যের সুরে।

সামগ্রিক বিচারে বীরাঙ্গনা কাব্যের গঠন কৌশল প্রশংসার দাবি রাখে। প্রীতি প্রবণতার উচ্ছ্বাসকে কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করে তার সঙ্গে নাটকীয় চমৎকারিত্বের অপ্রতিহত সমন্বয়ে বীরাঙ্গনা মধুর অসামান্য সৃষ্টি। অবশ্য সুকুমার সেন এ কাব্যের বিশ্লেষণে অধিকাংশ কবিতাকে ভাণিক্যকাব্য বলতে চেয়েছেন তবে স্বর্গতোক্তির মূলক করা জ্ঞাস্বর্গতোক্তির নায়িকাদের উচ্চারণ নাট্যনীতির মতো উচ্চারণ নয়। বরং পত্রলেখিকার সঙ্গোপন গভীরতায় সমাহিত। চরিত্রগুলির মনস্তাত্বিক বা Psycological dimention দিতে গিয়ে ওভিদের মতো মধুও চরিত্রগুলির মুখে নাটকীয় মনোলগ বসিয়েছেন। যার ফলে শুধু নায়িকা নয়— প্রতিপক্ষের পুরুষটিও প্রত্যবক্ষৎ হয়ে ওঠে পাঠকের কাছে। তবে শেষ বিচারের আমরা এটিকে ভাণিক্যকাব্য বা গীতিকাব্য অভিধায় গ্রহণ না করে পত্রকাব্য হিসাবেই চিহ্নিত করব। মধুর আগে বা পরে এ জাতীয় কাব্য রচিত হয়নি। গীতিকাব্যসুলভ রোমান্টিকতা, নাট্যরস, আখ্যানধর্মিতা এবং চরিত্র সর্বস্বতায় মিলনে ভারতীয় পুরাণ নৈতিকতার ফ্রেমে যে নারীদের চরিত্র এখানে তুলে ধরা হয়েছে তা প্রত্যেক স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল। সে হিসাবে প্রতিটি পত্রকবিতাই এখানে আপন গৌরবে সুসম্পূর্ণ। পত্র-আঙ্গিকে সাহিত্য রস ঢালার এমন চমৎকার দৃষ্টান্ত বাংলা সাহিত্যে দুটি নেই। একা দশটি নারী আলেখ্যের এই সজ্জা যে মনোরম ঐক্যতান শুরু করেছে তাকে পত্রকাব্য ছাড়া অন্য কোনো অভিধায় ভূষিত করা উচিত নয়।

2.'বীরাঙ্গনা কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রভাব কতটা লক্ষণীয় তা আলোচনা করো।

মধুসূদন তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যর সুন্দর মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। বীরাঙ্গনা কাব্যের কায়া নির্মাণে তিনি অনেকাংশেই পাশ্চাত্য কবি ওভিদের অনুসারী। তবে আঙ্গিকের দিক থেকে শুধু পাশ্চাত্য নয়, প্রাচীন ভারতীয় অলংকার শাস্ত্রের প্রভাবও কিছু আছে। সাহিত্য দর্পণে পৌরাণিক নায়িকাদের নিজ নিজ নায়ক বা প্রেমিকাদের কাছে পত্র লেখার প্রসঙ্গ আছে। বীরাঙ্গনার আখ্যাপত্রে একটি প্রাসঙ্গিক শ্লেষাংশ উদ্ধৃত হয়েছে—

"লেখা প্রস্থাপণেঃ
নার্য্যা ভাবাভিব্যক্তিরিষ্যতে।"

এখানে উল্লেখ করা উচিত সংস্কৃত সাহিত্যের পত্রগুলি খুবই সংহতশ্লিষ্ট রচনা। মধুসূদনের পত্র পত্রিকার মতো বিশিষ্ট কোনোটিই নয়। এখন দেখা যেতে পারে মধুসূদন পৌরাণিক নায়িকাদের প্রেম মনস্তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে প্রাচ্য ভাবমণ্ডল সৃষ্টিতে কতখানি কুশলতা দেখিয়েছেন। যেমন দুষ্মন্তের প্রতি শকুন্তলা পত্রিকায় কালিদাসের নাটকের প্রসিদ্ধ আখ্যান অনেকটা অনুসরণ করলেও শকুন্তলা নায়িকা চরিত্র রূপে নতুন সৃষ্টির মূল্য পেয়েছে। এছাড়াও ভারতীয় জীবনের মধ্যে যে কর্মফলবাদ, অদৃষ্টবাদ, ও জন্মান্তরবাদের সুস্পষ্ট প্রভাব লক্ষ করা যায়, মাইকেলের এই কাব্যের নায়িকাদের নানা বক্তব্যের মাধ্যমেও এই দিকগুলি ফুটে উঠেছে। তাঁদের প্রেম, ক্রোধ, অভিমান সবই এই পাপ পুণ্য ন্যায়-অন্যায় বোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন—

- শকুন্তলা—কৈ পাপে পীড়ন বিধি'
- কেকয়ী—'পাপ পুরী'
- কেকয়ী—'পরম অর্ধমচারী'
- দুঃশলা—'অন্যায় সমর' ইত্যাদি।

মাইকেলের নায়িকাগণ ভারতীয় পাপপুণ্য বোধের দ্বারা চালিত ছিলেন বলে তাঁরা আশাবাদী ও পোষণ করেছেন। তাঁরা জানতেন, তাঁদের পাপপুণ্য-ই তাঁদের আশা পূরণ করবে। আশাবাদের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। যেমন—

- শকুন্তলা—'জীবনের আশা হয়ে কে ত্যজে সহজে।
- কেকয়ী—'বৃথা আশা' ইত্যাদি।

এছাড়াও প্রাচ্য পটভূমি মনে করে প্রাচীন ভারতীয় রাজধর্ম, রাজকর্তব্য, দৈনন্দিন আচার অনুষ্ঠানের চিত্র ধরা পড়েছে বেশ কিছু পত্রে। যেমন তারার পত্রে ব্রহ্মদেবের প্রত্যুষ থেকে রাত্রি পর্যন্ত জীবনযাত্রা পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্রিত হয়েছে। তবে প্রাচ্য পটভূমি এত বিশাল থাকলেও পটভূমি কিন্তু শুধুই কারা বা আঙ্গিকের দিক থেকে প্রভাব বিস্তার করে শেষ হয়ে যায়নি। বীরাঙ্গনা কাব্যের সফলতার অন্যতম দাবিদার তার ছন্দ, আর এই অমিত্রাক্ষর ছন্দের ধারণাটিও কিন্তু পাশ্চাত্য থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন মধুসূদন। মিল্টনের Blank verse-এর অনুসরণ তিনি এই ছন্দ প্রণয়ন করেন।

তবে উপসংহারে বলাই যায়, শুধু প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য প্রভাবই নয়, মধুর 'আপন মনের মাধুরী ও মিশেছিল বীরাঙ্গনা কাব্যের ছত্রে ছত্রে, তবেই তো বীরাঙ্গনা কাব্য কালজয়ী

3.'বীরাঙ্গনা কাব্যের নারী চরিত্র কোন অর্থে বীরাঙ্গনা? বীরাঙ্গনা কাব্যে আধুনিকতার লক্ষণ কী কী ভাবে প্রকাশিত?

OR

পৌরাণিক নারীচরিত্রগুলি কীভাবে মধুসূদনের হাতে নবরূপ লাভ করেছে তা আলোচনা করো। বীরাঙ্গনাকে নারীমুক্তির কাব্য বলা যায় কি?

মধুসূদন দত্ত যখন বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করেন, বাংলা সাহিত্যে অন্তত তখন নারী চিত্তমুক্তির কোনো সচেতন প্রত্যাশা ব্যক্ত হয়নি। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দেবদেবী অধ্যুষিত ক্ষেত্রে, নারী কেন পুরুষের স্বাধীনতাও বিশেষ কখনও স্বীকৃত হয়নি। সপ্তদশ শতকের মুসলিম কবিরা এবং ময়মনসিংহ গীতিকার কবিগণ নারী চিত্তের আশা আকাঙ্ক্ষা অস্ফুট উন্মোচন অন্তত ঘটিয়েছিলেন ; মনসামঙ্গলের কবিরা চাঁদ সদাগর নামক পুরুষটিকে কিছুটা স্বাধীনভাবে বিচরণের সুযোগ দিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহচর্যের ফলে এদেশে এক ভাব বিপ্লবের সূচনা হয়। ফরাসি নবজাগরণ বা রেনেসাঁসের আদলে একে ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণের আখ্যা দেওয়া হয়। এ ধরনের ভাব বিপ্লবে তিন রকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । এক্ষেত্রেও তাই দেখা গিয়েছিল। আমাদের সমাজে নারী স্থান ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ। নারীর মূল্য পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা, রামমোহনের সতীদাহ রোধ এবং বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সামাজিক উপন্যাসে নারীর বৈধব্যের জ্বালা সম্পর্কে কিছু চিন্তাভাবনার পরিচয় দিয়েছিল। কিন্তু তাঁর নীতি নিয়ন্ত্রিত মনোভাবের জন্য এ ধরনের চরিত্রের প্রতি শেষ পর্যন্ত সুবিচার করতে পারেননি। অবশ্য ব্যতিক্রম হিসাবে আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীর উপন্যাসে তিনি নারীদের বিরাট কর্মক্ষেত্রে আহ্বান করেছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্প কবিতা, গানে নারীচিত্তমুক্তির কথা নিঃসংশয় উচ্চারণ করলেন এবং দাম্পত্য সমাজ জীবনে নারীর প্রকৃত স্থান নির্দেশ করে দিলেন। কবিতায় তাঁর নায়িকা বলেছেন-আমি নারী আমি মহিয়সী/আমার সুরে সুরে বেঁধেছে জ্যোৎস্না রাতের/নিদ্রাবিহীন শশী। বদনাম গল্পের নায়িকা বলেছে—"পুরুষেরা বোকা, তারা আমাদের বলে সরলা, অবলা—এই নামের আড়ালেই আমরা করে থাকি আর এই খোকার বাবারা মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা অবলা কুকুরের গলায় শিকলের মতো এই খ্যাতি গলায় পরে থাকি। আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও।"

সাহিত্যের নারী চিত্তের মুক্তি ঘোষণা মধুসূদনের সময়ে সম্ভব হয়নি সত্য। কিন্তু তিনি এমন একটি কাজ করেছিলেন যাতে তাঁকে নারী চিত্তমুক্তির অগ্রদূত হিসাবে সম্মান জানতে হবে। মেঘনাদবধ কাব্যের 'চিত্রাঙ্গদা' চরিত্রটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। বীরত্বের সংস্কার ও স্তোকবাক্য দিয়ে তার পুত্র শোক দমিত করা যায় না, মিথ্যা বীরত্বের অহংকারের চেয়ে এই মানবীমাতার পুত্রশোক অনেক বাস্তব সত্য। বীরাঙ্গনা কাব্যের নারীদের ক্ষেত্রে মানবিকতা স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।
'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকে শকুন্তলা দুষ্মন্তের চিন্তায় কীরকম বিভোর হয়ে থাকতেন তার আভাষ আমরা পাই দুর্বাশার অভিশাপে, কিন্তু তার বিরহিণী চিত্তের সতৃ প্রতীক্ষা সর্বপ্রকার মান অভিমান বিরহজ্বালা নিয়ে শকুন্তলা কতখানি মানবীয় হয়ে উঠতে পারে, তার প্রমাণ আমরা পাই বীরাঙ্গনা কাব্যে। কালিদাসের নাটকে সেই বিরহের মর্মর মূর্তি এখানে পরিণত হয়েছে এক সজীব নারীতে।

সামাজিক সম্পর্ক ও হৃদয়ের সম্পর্কের মধ্যে ব্যবধান যে অনেক সময়ই থাকে এবং সমাজের আরোপিত সম্পর্কের চেয়ে হৃদয়ের সম্পর্ক অনেক সময়ই যে বড়ো হয়ে ওঠে মধুসূদনের দ্বিতীয় সর্গে তারা দেবীকে অবলম্বন করে তার দীপ্ত ধ্বনিতে পরিণত করেছেন। তারা সামদেবের গুরুপত্নী— এটাই তার সামাজিক সম্পর্ক, কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয় সে সম্পর্ক করে নেয় তাই গড়ে উঠেছিল সোমের সঙ্গে এ সম্পর্ক প্রেমের। সামাজিক অবৈধ প্রেমের সঙ্গে এই স্বীকৃতিতে তারা সতীত্বের ব্যাখ্যা করতে পারেনি। একথা সত্য কিন্তু মানবিকার সম্পর্কের এই সততা রক্ষায় একটি বলিষ্ঠ নারী ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

আর একটি মানবিক সত্যভাষণা পাই আমরা ষষ্ঠ সর্গে দ্রৌপদীর পত্রে। পাণ্ডবদের মাতৃভক্তি অতুলনীয়। মায়ের কথায় তারা দ্রৌপদীকে পাঁচভাগ করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ পাঁচজনই একত্রে পত্নীত্বে বরণ করেছিলেন দ্রৌপদীকে। কিন্তু দ্রৌপদীর পক্ষে এটার সম্ভবপরতার প্রশ্ন নিয়ে মহাভারত নামক পুরাণ সম্ভব, কিন্তু মানুষের মন অথবা নারীর মন সম্বন্ধে সত্যভাষণ যদি কেউ করেন তাহলে বলতেই হবে এ ঘটনা সম্ভব হতে পারে না, যে পুরুষ শ্রেষ্ঠতর বিনিময়ে অর্জন করেছে একটি ক্ষত্রিয় নারীকে সে হয়তো তার অধিকার অনেকাংশে ত্যাগ করতে পারে ভ্রাতৃনিষ্ঠায় কিন্তু বীরত্বের উজ্জ্বল আদর্শে যিনি একটি যুবতী মনের একছত্র সাম্রাজ্যে অধিকার করে আছেন সেই অধিকারটি কি মন থেকে সরে যেতে পারে ? গুরুজনের অনুজ্ঞায় যেতে সে পারে না, এই মানবী সত্যটি অচঞ্চলভাবে উচ্চারণ করেছে দ্রৌপদী। সে নিঃশঙ্কোচভাবে স্বীকার করেছে অর্জুনই তার স্বামী আর কেউ নয়।

'পাঞ্চালীর চির বা পাঞ্চলীর প্রতি
ধনঞ্জয়।

—এই সত্যকথাটি উচ্চারণ করার জন্যে ধর্ম যদি তাকে পাপ দেয়, সেই দন্ড সে অক্লেশে বহন করতে পারবে, একথাও সে বলেছে, নারীর এই স্বাধীন চিন্তায় কবি উন্মোচিত করতে পেরেছেন। স্বামীকে

অন্ধভাবে অনুসরণই পত্নীর পরমব্রত তাতেই সতীত্বের পরাকাষ্ঠা, ভারতীয় রীতিতে এই সংস্কার নারীত্বকে বহুদিক অবদমিত রেখেছে। বীরাঙ্গনা কাব্যের কয়েকটি নায়িকার মাধ্যমে এই অবদমিত নারীত্বকে উন্মোচিত করার বিপ্লবাত্মক কর্মে প্রয়াসী হয়েছেন কবি। দুর্যোধনের কর্মপ্রণালীর সমালোচনা করেছেন ভানুমতী তাঁর স্ত্রী সপ্তম সর্গে। পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্ররোচনা তাঁকে অন্যায়ভাবে দিয়েছেন কষ্ট, এই প্ররোচনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে যথার্থ শুভার্থী পাণ্ডবদের বিরুদ্ধে যে দুর্যোধনের করা উচিত নয়, সেকথা ভানুমতি তার চিঠিতে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছে।

অপর নায়িকা জনার অবশ্য এই ধরনের শান্তভাবে কিছু বোঝানোর মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। যোগ্য বীরসন্তান প্রবীরকে অন্যায় যুদ্ধে হত্যা করেছেন অর্জুন। সেই পুত্রঘাতি শত্রুকে তাঁর স্বামী কেবল নিষ্কৃতি দেননি। তাঁকে মহিমপুরীতে ডেকে নিয়ে এসে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক পাতাবার চেষ্টা করেছে। এই ঘটনা জনাকে প্রায় উন্মত্ত করে তুলেছে। স্বামীকে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। অর্জ্জুনকে নবরূপী নারায়ণ মনে করে পুজো করার প্রচেষ্টা অর্থহীন। স্বৈরিণী মাতারা গর্ভে নারায়ণ জন্মগ্রহণ করতে এসেছেন একথা বিশ্বাস করা যায় না। ব্যাসদেব অর্জুনের জয়গান গাইলেও তার জীবন কলঙ্কিত। দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, প্রবীরকে তিনটে কাপুরুষেচিত উপায়ে হত্যা করেছেন তাতে বীর মাত্রেরই মনে লজ্জা হওয়া উচিত। জনা যখন এত দৃষ্টান্ত দিয়েও স্বামী নীলধ্বজকে বিচলিত করতে পারেননি তখন তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপ বর্ষণ করেছেন। একটি নারী ব্যক্তিত্বের এই স্ফূরণ আমাদের বিস্মৃত করে।

এই ব্যক্তিত্বেরই একটি দিক আমরা দেখি অষ্টম সর্গে অঙ্কিত দুঃশলা চরিত্রে। স্বামী জয়দ্রথকে বধ করার যে ভীষণ প্রতিজ্ঞা অর্জুন করেছিলেন তা শুনেই যুদ্ধের বিভীষিকা বর্জন করে সে শান্ত সুন্দর এক তীক্ষ্ণতর দাম্পত্য জীবনের আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর স্বামীকে।

পৌরাণিক চরিত্র নতুনতর ব্যঞ্জনায় প্রায় নতুন হয়ে উঠেছে চতুর্থ ও পঞ্চম সর্গে। দশরথের স্ত্রী কৈকেয়ী রাজাকে সত্যভঙ্গের অপরাধে অপরাধী করেছে এবং এই সত্য রাজার দুটি বরদানে পৌরাণিক স্বীকৃতি নয়। মানবিক দুর্বলতাক্রমে প্রদত্ত বধূর আশ্বাস। কৈকেয়ীর যৌবন সুধা পানে তৃপ্ত রাজা দশরথ কামামোদে মত্ত হয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার গর্ভজাতপুত্র ভরতই যুবরাজ পদে অধীষ্ঠ হবে। সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পর একেবারেই মানসিক কারণে কৈকেয়ী রাজাকে অভিযুক্ত করেছে। শূর্পণখা চরিত্রটি আরও মানসিক ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে কবির হাতে। মধুসূদন ভোলেননি সে রাবণের ভগ্নী, অতুল ঐশ্বর্য সুখে প্রতিপালিতা রাক্ষস কুলোদ্ভব এবং রাম রূপবিদ্যায় পারদর্শিনী, মানবিক প্রেমেই আপ্লুত হয়ে সে লক্ষ্মণের কাছে প্রেম নিবেদন করছে, প্রেমাস্পদের কাছ থেকে স্বীকৃতি পাবার জন্য সমস্ত দুঃখ বহন এবং ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে। পৌরাণিক রাক্ষসী চরিত্রের মাধ্যমে প্রেমময়ী নারী করে তুলেছেন।

এই কারণেই বলা যায় মধুসূদন তাঁর 'বীরাঙ্গনা' কাব্যে আধুনিক চেতনার স্পষ্ট প্রমাণ রেখেছেন। ঊনবিংশ শতকের নবজাগরণ যে মানবিকবোধ জাগিয়ে তুলেছিল মধুসূদনের স্পষ্ট নারীচরিত্রগুলি সেই মানবিক বোধে উজ্জীবিত। ফলে বাংলা সাহিত্যে নারীমুক্তির যে আন্দোলন সূচিত হয়েছে উত্তরকালে, মধুসূদনকে তার অগ্রপথিক বলা যায়—অন্ত্যজ বীরাঙ্গনা তারই সুস্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে।

এই প্রশ্নের অনুকরণে লেখা যায়—
(১) উনিশ শতকের নারী ব্যক্তিত্বের জাগরণ কীভাবে ও কতটা বীরাঙ্গনা কাব্যে রাজ করেছে আলোচনা করো। অথবা (২) বীরাঙ্গনা কাব্য সৃষ্টিতে কবির কোনো উদ্দেশ্যমূলকতা কাজ করেছে কিনা তা পাশ্চাত্য প্রভাব ও কাব্যের উৎসর্গের দিকে লক্ষ্য রেখে আলোচনা করো। অথবা (৩) বীরাঙ্গনা কাব্যে নারীমুক্তির কথা বলা হয়েছে আলোচনা করো। অথবা (৪) বীরাঙ্গনা কাব্যে রেনেসাঁসের প্রভাব আলোচনা করো। অথবা (৫) বীরাঙ্গনা কাব্যের কাহিনি সূত্র পৌরাণিক হলেও চরিত্রগুলি একেবারেই আধুনিক আলোচনা করো। অথবা (৬) মধুসূদনের বীরাঙ্গনা কাব্যে এমন কতকগুলি লক্ষণ পাই যাদের যথার্থ আধুনিক বলে বোধ হয়—আলোচনা করো।

4.'বীরাঙ্গনা' কাব্যের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।

মেঘনাদবধ' কাব্যে ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্য কবি মধুসূদনের বিজয় বৈজয়ন্তী। যদি মেঘনাদবধ কাব্যকে বলা যায় সুমহান, তবে বীরঙ্গনাকে বলতে হয় সুমধুর। প্রথমটির মধ্যে আছে ভাবকল্পনার বিরাটত্ব, দ্বিতীয়টির মধ্যে আছে রসব্যঞ্জনার অভিনবত্ব। একটি জাতির হৃদয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত, অন্যটি ব্যক্তির মর্মরসে অভিষিক্ত। একটিতে গভীর গাম্ভীর্য, অন্যটিতে ললিত লাবণ্য। একটি হিমালয়, অন্যটি তাজমহল। একটি শ্রদ্ধেয়, অপরটি প্রিয়।

'বীরাঙ্গনা' কাব্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে প্রাক্ বীরাঙ্গনা অঙ্গনাদের ভুললে চলবে না। নারীর সৌন্দর্যচেতনা, নারীর প্রতি শ্রদ্ধা, নারীত্বের প্রতি সম্মান নবজাগৃতির আদর্শের উদ্‌বোধন ঘটিয়েছে। আত্মপ্রত্যয়ী শব্দসচেতন কবি মধুসূদন বীরাঙ্গনা নামকরণের মধ্যেই শ্রদ্ধা ও সৌন্দর্যের এক মিলিত রূপের পরিচয় রেখে গিয়েছেন। মধুসূদনের কাব্যের নামকরণের গভীরতা অনেক সমালোচক উপলব্ধি করতে না পেরে নিজেও বিভ্রান্ত হয়েছেন অপরকেও বিভ্রান্ত করেছেন। মধুসূদন সম্পর্কে কোনো স্পর্ধিত উক্তি প্রকাশ করবার পূর্বে একটু বিবেচনা করে দেখা দরকার। বীরাঙ্গনা কাব্যের নামকরণের তাৎপর্য অনুধাবনের পূর্বে সাধারণভাবে বীরাঙ্গনা সম্পর্কে মধুসূদনের বক্তব্য জানা দরকার।

...But within the last few weeks, I have been scribbling a thing to be called বীরাঙ্গনা i.e., Heroic epistles from the most moted puranic women to their lovers or lords. There are to be twenty one epistles, and I have finished eleven. Those are being printed off, for I have no time to finish the remainder..... The first series contain (1) Sacuntala to Dusmanta, (2) Tara to Some, (3) Rukmini to Dwarakanath, (4) Kaikayee to Dasarath, (5) Suparnakha to Lakshman, (6) Droupadi to Arjuna, (7) Bhanumati to Durjodhana, (8) Dushala to Jayadratha,(9) Jana to Niladhwaja, (10) Jahnavi to Santanu, (11) Urbashi to Purwrabas, a goodly list, my friend....But I suppose, my poetical carrer is drawing to a close. I am making arrangments to go to England to study for the Bar and must bid adiue to the Muse."

এখন মধুসূদনের ভাষায় noted women বলতে তিনি কি বোঝাতে চেয়েছেন, তা আমাদের অনুধাবন করা প্রয়োজন। একাদশ পত্রিকার মধ্যে দ্রৌপদী, ভানুমতী, দুঃশলা এবং জনা—এই চারজন ক্ষাত্ররমণী হলেও, একমাত্র জনা ব্যতীত ক্ষাত্ররমণীসুলভ তেজস্বিতা কারোর মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। জনাকে বাদ দিলে ক্ষাত্ররমণী থাকে তিনজন—দ্রৌপদী দুঃশালা ও ভানুমতী। দ্রৌপদীর পত্রে স্বামীর বীর্যবত্তার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ পেলেও তিনি নিজের প্রেমময়ী সত্তাটিকেই সুন্দরভাবে উপস্থাপিত

করেছেন। বাকী দুইটি ক্ষাত্রনারী চরিত্র—দুঃশলা ও ভানুমতীর চরিত্রে বীর্যবত্তা তো নেই, বরং তার বিপরীত চিত্রই লক্ষ্য করা যায়। পত্রিকারম্ভে ভানুমতী লিখেছেন—

অধীর সতত দাসী, যে অবধি তুমি
কবি যাত্রা পশিয়াছ কুরুক্ষেত্র রণে
নাহি নিদ্রা, নাহি রুচি, হে নাথ আহারে।

মধুসূদনের যদি ভানুমতীকে বীর্যবতী রমণী বলে অঙ্কন করার বাসনা থাকত তবে কখনই তিনি ভানুমতীর মুখে এইপ্রকার সংলাপ সংযুক্ত করতেন না। ক্ষত্রিয় নৃপতির কাছে যুদ্ধ-বিগ্রহ আকস্মিক ব্যাপার নয় তা চূড়ান্ত ভীতিপ্রদত্তও নয়। তেমন ক্ষত্রিয় নৃপতির স্ত্রী হয়ে যুদ্ধের নামে মুর্চ্ছা যাবেন এটি অকল্পিত। সুতরাং ক্ষত্রিয় রমণীর বীর্যপ্রকাশ করবার জন্য মধুসূদন লেখনী ধারণ করেনি।

দুঃশলাও স্বামীকে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করে আসবার জন্য অনুনয় করে পত্র লিখেছিলেন—

এক তুমি, এস নাথ, রণপরিহরি।
ফেলি দূরে বর্ম, চর্ম, অসি, তূণ, ধনুঃ
ত্যজি রথ, পদব্রজে এস মোর পাশে
কপোত মিথুন সব যাব উড়ি নীড়ে।

অধিক উদ্ধৃতির প্রয়োজন নেই। এই থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বীর নারী চরিত্র অঙ্কন করবার বাসনা মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল না। সুতরাং 'বীরাঙ্গনা' শব্দটি শোনামাত্র রাণী দুর্গাবতী, ঝান্সির রাণী লক্ষ্মীবাই-এর কথা যাদের মনে উদিত হয় এবং সেই আদর্শে বীরাঙ্গনা নাম চরিত্র ও নামকরণের সার্থকতা বিচার করতে বসেন, তারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বীরাঙ্গনা শব্দটি বিশ্লেষণ করলে বীরা ও অঙ্গনা দুইটি শব্দ পাওয়া যায়। বীরা শব্দের অর্থ যে নারীর পতি ও পুত্র বর্তমান। ইহার বিপরীতেই অবীরা শব্দটি গঠিত হয়েছে। এখন বীরা শব্দ ধরে বীরাঙ্গনার অর্থ বিচার করতে করতে গেলে বিভ্রান্তির মধ্যে পড়তে হবে। বীরাঙ্গনার কোন কোন্ নায়িকার পতি ও পুত্র বর্তমান থাকলেও প্রত্যেক নায়িকা সম্পর্কে তা প্রযোজ্য নয়। তার ওপর নায়িকাদের মধ্যে কেউ বা কুমারী, কেউ বা বিধবা, কেউ বা বারবণিতা এবং কেউ বা বিবাহিতা হলেও অপুত্রক। সুতরাং এস্থলে বীরা শব্দটি গ্রহণীয় নয়।

কোনো একজন সমালোচক বলেছেন যে, এই কাব্যের নারীর সাহসের সঙ্গে নিজের অন্তর্জীবনের কথা অবলীলাক্রমে প্রকাশ করেছেন। বীরত্বের সঙ্গে আত্মঘোষণার জন্য এই নাম পরিকল্পিত হয়েছে। কাব্যের প্রত্যেক নায়িকার মনোধর্মের নিরিখে এই মন্তব্য অযথার্থ নয়। তবে বীরাঙ্গনা শব্দ সম্পর্কে আরও গভীরভাবে চিন্তা করবার আছে।

বীর শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে বি + ইব পাওয়া যায়। এর এক অর্থ বিশিষ্ট প্রেরণা।

এই অর্থে বীরাঙ্গনার অর্থ ধরলে অর্থ হয় বিশিষ্ট প্রেরণাদাত্রী নারী। নারী তো পুরুষের মনে প্রেরণা জাগায়। বীরাঙ্গনা কাব্যের অর্জুনের প্রতি দৌপদী কবিতায় এরই স্পষ্ট পরিচয় আছে। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় ব্রাহ্মণবেশী অর্জুনকে সভাস্থ সকল নৃপতি যখন বেষ্টন করে যুদ্ধের প্রতি প্রস্তুত হচ্ছিল তখন অর্জুন দ্রৌপদীকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন—

আশারূপে মোর পাশে দাঁড়াও রূপসি!
দ্বিগুণ বাড়িবে বল চন্দ্রমুখ হেরি
চন্দ্রমুখি।

এই অর্থ শুধু অভিধানেই লিপিবদ্ধ নয়, মধুসূদনের কাব্যেও এরও সমর্থন আছে এবং এই প্রকার অর্থ বিচার যুক্তিসহ ও যথার্থ। কিন্তু এই অর্থে মধুসূদনের চরিত্রগুলি Most noted Puranic women নয়। অর্থাৎ বীরের এই গ্রহণযোগ্য হলেও তা মধুসূদনের অভিলাষিত অর্থ নয়।

বীর শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় বীর—অ(অচ) ক। এর অর্থ শ্রেষ্ঠ বা উত্তম। তিন লিঙ্গে একই ব্যবহারর। হেমচন্দ্রও এই অর্থের নির্দেশ দিয়েছেন। এই অর্থ মূল বেদের মধ্যেই গৃহীত হয়েছে। আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে ঋগ্বেদব শ্লোকটির অনুসরণ করা যেতে পারে—

ইহা হি বা বিধতে রত্নমস্তীদা
বীরায় দাশুষ উষাসঃ।
(ঋগ্বেদ-৬ : ৬৫ : ৪)

কেবল সংস্কৃতেই নয় বাঙলা ভাষাতেও বীর শব্দ শ্রেষ্ঠ অর্থে বহুস্থানে প্রযুক্ত হয়েছে। চিন্তাবীর, ধর্মবীর, কর্মবীর শব্দগুলি এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। চিন্তাবীর শব্দটিই ধরা যাক। এর অর্থ চিন্তার বীরত্ব দেখিয়েছিলেন এমন নিশ্চয়ই নয়। এর অর্থ শ্রেষ্ঠ চিত্তক। সুতরাং বাঙলাতেও বীর অর্থে শ্রেষ্ঠ প্রযুক্ত।

এখন বীরাঙ্গনা শব্দটিকে ভাঙলে বীর ও অঙ্গনা পাওয়া যায়। বীর শব্দটি এ স্থলে অঙ্গনার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং বীরাঙ্গনা শব্দটির অর্থ এখানে শ্রেষ্ঠ নারী।

কিন্তু এতেই সবটুকু নয়। অঙ্গনা শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে আরও উল্লেখযোগ্য পরিচয় লাভ করতে পারব। কারণ অঙ্গনার অর্থ শুধুমাত্র নারী, ললনা, কামিনীর বা রমণী নয়। অঙ্গনা শব্দের বিভাজনে পাওয়া যায়-অঙ্গন (প্রশংসার্থে) + আ (স্ত্রীলিঙ্গে)— অঙ্গ সুন্দর যে নারীর। অতএব বীরাঙ্গনা শব্দটির অর্থ হল শ্রেষ্ঠ সুন্দরী নারী। এই শ্রেষ্ঠত্ব বীর্যের বিচারে। সুতরাং বীরাঙ্গনা শব্দটির মধ্যেই বীর্য ও সৌন্দর্যের মিলিত পরিচয় নিহিত আছে।

মধুসূদন একেই বলেছেন Most noted Puranic women রেনেসাঁসের চেতনায় প্রত্যয়বান মধুসূদন সৌন্দর্য মাধুর্যের সঙ্গে বীর্যের সম্মিলন ঘটিয়েই নারীকে মহিমান্বিত করে তুলেছেন। নারীদেহকে স্থূল দেহ-প্রবৃত্তি চারিতার্থতার যন্ত্ররূপে দেখেননি, তার মধ্যে সৌন্দর্য-চেতনা জাগ্রত করেছেন। তিনি কেবল নারীর অশ্রুসজল বিষাদিনী মূর্তিই অঙ্কন করেননি প্রেমের বীর্যে অশংকিনী মূর্তিও উপস্থাপিত করেছেন। এরই পূর্ণতম অভিব্যক্তি বীরাঙ্গনা কাব্যে।

নবযুগের স্বাতন্ত্র্যময়ী নারীকে অঙ্গনা ছাড়া আর কোনো শব্দে বিশষিত করা যায় ? শব্দ সচেতন কবি মধুসূদন সঙ্গতভাবেই ওই নামকরণ গ্রহণ করেছেন। অন্য কোনো স্ত্রী বাচক শব্দের মধ্যে এমন সুরুচি, সঙ্গতি ও সৌন্দর্যের পরিচয় মেলে না। অঙ্গনার সমগোত্রীয় শব্দ—নারী, ললনা, কামিনী, রমণী ইত্যাদি শব্দগুলির তাৎপর্য অনুধাবন করলেই আমাদের উক্তির যথার্থতা প্রতিপন্ন হবে। নারী শব্দ নর নির্ভর–সুতরাং এই শব্দ নারীর স্বাতন্ত্র্য বিকাশের সহায়ক নয় । যে নারী কেবল পুরুষের মুখাপেক্ষী সে নারী মধুসূদনের মানস দুহিতা হবার যোগ্যতা রাখেনা। নারী শব্দটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় নর+অ() + ঈপ (ধর্মার্থে)—অর্থাৎ মনুষ্য জাতির যে অংশ সন্তান প্রসব করে। এমন শব্দ মধুসূদন নিশ্চয়ই গ্রহণ করেননি। নারীর অপর প্রতিশব্দ ললনা-লল্ / অট—অর্থাৎ কটাক্ষ, ভঙ্গী প্রদর্শনকারী রমণী। ছলকলায় এই ললনা অভিজ্ঞ। এই ললনার পরিচয় পেতে হলে ভারতচন্দ্রই যথেষ্ট, তার জন্য মধুসূদনের প্রয়োজন নেই।

নারীর প্রতিশব্দ কামিনী ধরলে অর্থ হয় কামিনী নারী। কাম + ইন (অস্প্যর্থে) + ই (স্ত্রীলিঙ্গ)। মধুসূদনের নারী চরিত্রে কামের পারবশ্য নেই, আছে প্রেমের বীর্য। কামের ঊর্ধ্বে প্রেমকে মধুসূদনই সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠা নেই। তাঁর জীবনে ও কাব্যে এই পরিচয় ছড়িয়ে আছে। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মধুসূদন কামিনী শব্দ গ্রহণ করেননি। রমণী শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়—রম্ + নিচ + অন (ম) + ঈ (স্ত্রী) এর শব্দার্থ হল রমনকারিণী অর্থাৎ রতিক্রিয়াকারিনী নারী। শব্দটির মধ্যে মধুসূদন অবশ্যই সুরুচি ও শিষ্টতা খুঁজে পাননি। সতী, সাধ্বী শব্দগুলি বহু ব্যবহার মলিন এবং তাদের ব্যবহার এক পক্ষের। অভ্রান্ত কবি সংস্কারের ফলেই মধুসূধন অঙ্গনা শব্দটিকে বেছে নিয়েছেন। সৌন্দর্য প্রেম ও বীর্যে বীরাঙ্গনার প্রতিটি চরিত্রই অনন্যসাধারণ হয়ে উঠেছে। সুতরাং কাব্যটির বীরাঙ্গনা নাম সার্থক হয়ে উঠেছে।

5. ‘সোমের প্রতি তারা' পত্রিকাটির ভাববস্তু বিশ্লেষণ করো।

পত্রিকাটির সূচনাতেই দেখা যায়, সম্বোধন নিয়ে পত্র লেখিকার সবিশেষ সংকোচ সংকোচের কারণটি হল, প্রণয় ব্যাপারে পারস্পরিক সম্পর্কের বিরুদ্ধতা। দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী হয়ে তারা প্রণয় ভিক্ষা করছেন বৃহস্পতির শিষ্য সোমের কাছে। সমাজ ও ধর্মের চোখে উভয়ের প্রেম অবৈধ ও নিন্দিত। কিন্তু হৃদয়াবেগ ও কাম প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে গুরুপত্নী তারা নিজেকে কিছুতেই যেন সংযত রাখতে পারছেন না। অপরাধ জেনেও তিনি ভেসে চলেছেন কামনার প্রবল ভাবোচ্ছ্বাসে। চিঠির ভাষাতেও এই অসংযত কামনার গাঢ় রং। ‘সুধাংশু সিধি, আমি গুরুপত্নী! তুমি পুরুষরত্ন! কী কপাল, সম্পর্কের কথা ভুলে গিয়ে ইচ্ছে করছে তোমার পদসেবা করতে। খুবই লজ্জার কথা! পাপের কথা। জাতের এই পোড়া লেখনী একথা লিখছে কেমন করে তা ভাবলে শিহরিত হতে হয়। কিন্তু দোষটা কলমের ঘাড়ে চাপিয়ে কী লাভ ! বৃথা তাকে গঞ্জনা দেওয়া। মনের কথা লেখে কলম। তা মন পুড়লে কলমের কী দোষ ! সেও পুড়বেই! গাছের মাথায় বাজ পড়লে কেবল গাছ পোড়ে না, দগ্ধ হয়ে যায় তার পদাশ্রিত লতাও। এইভাবেই চন্দ্রের প্রতি তাঁর খেদোক্তি প্রকাশ করতে থাকে।

কুকর্মে রত দুর্বৃত্ত যেমন প্রথমেই নিভিয়ে দিতে চায় আলো, তেমনি স্মৃতিকে প্রথমেই আঁধারে ঢেকে দিতে চায় ‘পাপিনী’ তারা, সবই ধীরে ধীরে বিস্মৃত হতে চায় তারা, অতীত ভবিষ্যৎ সবই। ভুলে যেতে চায়, কে সে? কুল, মান, ধর্ম, লজ্জা, ভয়, সকল আজ তার কাছে তুচ্ছ, ফুলের খাঁচা ভেঙে কুল বিহঙ্গিনী বায়ুপথে উড়ে চলেছে। তারা অনুরোধ করেছে। ‘তারানাথ’ সোম এসে তাকে গ্রহণ করুন। 'ধর আসি তারে তারানাথ'। পদ্ম ফুলের বুকের গভীরে যেমন লুকিয়ে থাকে ‘সৌরভ’ সেইভাবে তারার হৃদয়ের গভীরে লুকিয়ে ছিল সোমের জন্য ভালোবাসা, জ্বলন্ত আগুনকে যেমন গোপন করা যায় না, সেই ভাবে ওই ভালোবাসাকে শেষে লুকিয়ে গোপন রাখা গেল না। নীলধ্বজ কন্দপ যেভাবে জিতে নেয় তার ‘পঞ্চঘর শর’ হেনে অসহায় পুরী সেইভাবে তারাকে জিতে নিয়েছে পুষ্পধনু। এখন সোম ছাড়া কে তাকে বাঁচাবে? তাই, ‘সোমের প্রতি তারা' পত্রিকাটিকে রোমান্টিক প্রেমের আলেখ্য হিসাবে বিচার করলে দেখা যায়–সংকোচ ও লজ্জার মধ্য দিয়ে বিকশিত হয়ে এটি সত্য সত্যই একটি সুন্দর কবিতা হয়ে উঠেছে, ‘Dramatic Manologue'-এর অবসর নেওয়ায় এর ভেতর দিয়ে আশ্চর্য এক নারী কন্ঠ শোনা যায়। এ নারী দ্বিধা ও সংশয়ে জর্জরিত হলেও, এ নারীর মধ্যে ভালোবাসার উদ্বেল উষ্মতার অনুভব করা যায়। এ পত্রিকার ‘তারা’ যেন রক্তমাংসের একটি জীবন্ত চরিত্র। সমাজের বাঁধন কেটে সে তার প্রেমকে অবলম্বন করেই মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চেয়েছে। সাহিত্য যদি Criticism of life হয়, এই পত্রিকাটিতে তার সুস্পষ্ট পরিচয় আছে। জীবনের কথা এমন নির্মমভাবে আমাদের সাহিত্যে খুব কমই বলা হয়েছে। শত ধিক্কার সহ্য করেও তারা ভারত

প্রেমকে ত্যাগ করতে পারেনি। এছাড়া শব্দের যথাযথ ব্যবহার, উপমা অলঙ্কারের প্রয়োগ এবং সেই নাটকীয় ভঙ্গি এই পত্রিকাটিকে 'বীরঙ্গনা' কাব্যে শ্রেষ্ঠ একটি পত্রিকায় পরিণত করেছে। বীরাঙ্গনায় প্রত্যেকটি নায়িকার মনোভাব স্পষ্টভাবেই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে এবং যেভাবে তাদের মনের প্রতিটি দল ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়েছে—তাতে নাটকীয়তা দেখা না দিয়ে পারেনি। পত্রিকাগুলি পাঠকের মনে কখনও কৌতুহল, কখনও বিস্ময়, কখনও অনিশ্চয়তা, কখনও দ্বন্দ্ব কখনও উত্তেজনা আবার কখনও চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। এতেই প্রমাণ হয় পত্রিকাগুলির মধ্যে নাটকীয় উপাদান আছে। তবে তার মধ্যে 'সোমের প্রতি তারা' নাটকীয় উপাদানগুলি সবচেয়ে বেশি স্ফূর্তি লাভ করেছে।

'সোমের প্রতি তারা' পত্রটিতে স্তরে স্তরে নাটকীয় অনুভূতি বিন্যস্ত। সোমদেব তারার স্বামী বৃহস্পতির অথচ পত্রের শুরুতেই দেখা যায় সোমদেবকে সম্বোধন করার জন্য তারা ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। তাই 'পুরুষ রত্ন' সম্বোধণে সম্বোধিত করলেন। তিনি দাসী হয়ে তাঁর পা দু'খানি সেবার ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন।

এই পত্রে তারার সূক্ষ্ম মানসিক দ্বন্দ্বের বিচিত্র অভিব্যক্তি আছে। চন্দ্রকে গুরু পত্নী তারা ভালোবেসেছিল। কিন্তু সে ভালোবাসার কথা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিতে পারছেন না। এই পত্রে যদিও তিনি মাঝে মাঝে তাঁর মনের কথা এবং চন্দ্রের প্রতি তাঁর পূর্ববর্তী আচার ব্যবহারের কারণ বিশ্লেষণ করে চন্দ্রকে তাঁর অপ্রতিরোধ্য প্রেম নিবেদন করেছেন তবু তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে এসেছে দ্বন্দ্ব, শুরু হয়েছে একান্ত আত্মধিক্কার। তাঁর প্রকৃত সত্তা হয়েছে জাগ্রত। চন্দ্রের প্রতি তাঁর ভালোবাসার এই যে সমাজ নিষিদ্ধ প্রেমাকাঙ্ক্ষা ও তজ্জনিত অন্তর্দ্বন্দ্ব এর মধ্যে দিয়েই কবিতাটি সার্থক হয়ে উঠেছে।

সোমের অপূর্ব রূপই তারাকে তাঁর প্রতি আকর্ষণ করেছে। অর্থাৎ চন্দ্রের প্রতি তারার রূপজ মোহই এখানে প্রধান। তারা সোমদেবকে প্রথম দর্শনেই ভালোবেসেছেন।

"যেদিন প্রথমে তুমি এ শান্ত আশ্রমে
প্রবেশিকা, নিশাকান্ত, সহসা ফুটিল
নব কুমুদিনী সম এ পরাণ মম
উল্লাসে।"

শ্রেয়েসী ও গুরুমা এই উভয় সত্তার দ্বন্দ্ব তারা চরিত্র একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তারা সোমদেবকে ভালোবেসেছেন, যে সোমদেব তাঁর স্বামীরা শিষ্য। তাঁর কন্ঠস্বর শুনে তাঁর মন ময়ূরের

মতো নাচত! প্রেয়সী সত্তার স্বাভাবিক গুণ প্রিয়জনের ভালোবাসার বস্তুর প্রতি আকর্ষণ। তারাও একই কারণে চন্দ্রের মতো মৃগ শিশু কোলে করে কাঁদেন।

প্রেয়সী সত্তার মূল গুণ হল এই ঈর্ষা। চন্দ্রের পাশে 'রোহিণীর স্বর্ণ কান্তি লক্ষ্য করে তারার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠত। সপত্নীবলে তাকে গালাগালিও করতেন, চন্দ্রের স্নেহধন্য কুমুদ পুষ্পকে ছিঁড়ে ফেলতেন। কিন্তু তারা নিজের গুরুমা সত্তাকে ভুলতে পারেন না। ভুলতে পারেন না 'জনম মম মহা ঋষি কুলে' তাই একথা ও বলতে ভুল করেন না 'হায়রে, কি পাপে বিধি এ তাপ লিখিল এ ভালে?' এবং আরও বলেন 'কোকিলের নীড়ে কিরে রাখিলি গোপনে কাকশিশু" লেখনীকেও গঞ্জনা দিতে ছাড়েন না তিনি। প্রেয়সী সত্তাকে জাগাবার আপ্রাণ চেষ্টার মাঝেও আত্মধিক্কার জাগে তাঁর 'পাপীয়সী' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করে।

অবশেষে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে তারা। সোমদেবের চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন। শেষ মুহূর্তে আর কলঙ্কের ভয় করেন না তারা, তাঁর মনোভাব এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল—

'দিনু জলাঞ্জলি কুল মানে তব জন্যে'।

তারার প্রেমিকা মূর্তির সত্যিকারের জাগরণ ঘটেছে। প্রেমিকের জন্য তিনি তপস্যায় বসার জন্য মনস্থির করে ফেলেছেন। তাই প্রেমিকের কাছে নিঃশর্তে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে তারার প্রেমিকা চরিত্রের পূর্ণ প্রস্ফুটন ঘটেছে। তাই তারা বলেছেন—

"জীবন মরণ মম আজি তব হতে।"

এই পত্রটিতে আমরা দেখতে পাই মধুসূদন যেমন নাট্যগুণের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন ঠিক তেমনি প্রেমের নিপুণ ছবি এঁকেছেন। ফলে পাঠকের মন বিগলিত হয়ে যায়।

6.বীরাঙ্গনা কাব্যের শকুন্তলা পত্রিকার নিরিখে শকুন্তলার চরিত্র ব্যাখ্যা করো | কালিদাসের শকুন্তলার সঙ্গে মধুসূদনের শকুন্তলার চরিত্রগত মিল অমিল আলোচনা করে দেখাও।

নবযুগস্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্তের বীরাঙ্গনা কাব্য এগারো জন পৌরাণিক নারীর, তাঁদের প্রিয় অথবা পতির উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রিকা সংকলন) বাংলা সাহিত্যে পত্রগল্প পত্রোপন্যাস অনেকে রচনা করেছেন কিন্তু পত্রকাব্য সম্ভবত এই একটিই রচিত হয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি যে এই কাব্যের প্রেরণা ও আদর্শ কবি লাভ করেছিলেন রোমক কবি ওভিদের রচিত দি হীরোইদেস থেকে এবং উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন বিভিন্ন পুরাণ, মহাকাব্য এবং প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের কাব্য থেকে।

বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম সর্গ শকুন্তলা পত্রিকার উপাদান কবি সংগ্রহ করেছিলেন মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ থেকে। কিন্তু তিনি হুবহু মহাকবিকে অনুকরণ না করে আপন প্রতিভা বলে সেখানে কিছু স্বকীয়তা বজায় রাখতে চেয়েছেন। ফলে মুহাকবির শকুন্তলার সঙ্গে বীরাঙ্গনা কাব্যের শকুত্তলার কিছু তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। তার প্রথম এবং প্রধান লক্ষণ হল মহাকবির শকুন্তলা বাকপটু নয়। দুষ্মন্তের বহু প্রশ্নের উত্তর তাঁর হয়ে তাঁর দুই সখী অনসূয়া এবং প্রিয়ম্বদা দিয়েছিলেন। কিন্তু মধুকবির শকুন্তলা নিজের অবস্থার কথা নিজে ব্যক্ত করতে পারেন। অথচ, পাছে দুষ্মন্তের নিন্দা করে, এই ভয়ে অনসূয়া প্রিয়ম্বদাকেও তিনি মনের ভাব গোপন করেন।

বীরাঙ্গনার শকুন্তলা আশ্রমকন্যা। তিনি নম্র, শান্ত। হিংসাদ্বেষ অসূয়ালেশহীন। উচ্চকণ্ঠে কথা তিনি বলতে পারেন না এমনকি অন্যের কোন দোষও তাঁর কাছে দৃষ্ট হয় না। পতি বিরহে বিরহিনী শকুন্তলা উৎকণ্ঠিতা। ঐ বুঝি তাঁর স্বামীর কাছ থেকে আহ্বান বার্তা এলো—এই কথা ভেবেই তার দিন কাটে। কিন্তু পরক্ষণেই ভুল ভাঙে—তিনি শোকে মুর্ছিত হয়ে যান।

শকুন্তলাকে গান্ধর্বমর্তে বিবাহ করে রাজা দুষ্মন্ত রাজ্যে ফিরে গেছেন। তিনি আর কোন সংবাদ বিনিময় করেন নি। এদিকে প্রোষিতভর্তৃকা শকুন্তলা বিরহে সব শূন্য সব অন্ধকারময় দেখছেন। কিন্তু তবুও শকুন্তলা তাঁর এই বিরহ-দহন মুখ বুজে সহ্য করেন। কেননা দাম্পত্য জীবনে অভিজ্ঞ না হলেও, কিম্বা পত্নীত্বের পূর্ণ দাবী করার অবকাশ বা সুযোগ তাঁর না থাকলেও তাঁর মধ্যে সাধ্বী রমণী সত্তা বিদ্যমান ছিল। ফলে পতির কল্যাণ কামনাই তাঁর জীবনের এক ব্রত স্বরূপ। সেই জন্যেই তিনি তাঁর অন্তরের দুঃখের করুণ কথা কারো কাছে প্রকাশ করতে পারছেন না। তাঁর ভয়, পাছে তাঁর দুঃখের কথা শুনে বনদেব-দেবী দুষ্মন্তকে অভিশাপ দেন কিম্বা তাঁকে বিবশা দেখলে তাঁর প্রিয় সখীদ্বয় ক্রুদ্ধ হয়ে দুষ্মন্তর নিন্দা করেন। ভারতীয় যে সংস্কার পত্নীকে পতির কল্যাণকামী করে তোলে এবং বিবাহের অব্যবহিত পর থেকেই নারী মনে সেই সংস্কার বদ্ধমূল হয়ে যায়। পুরাণ উপাখ্যান থেকে দৃষ্টান্ত টেনে দেখানো যায়, এই সংস্কার এতই বদ্ধমূল ছিল সতীর মনে যার ফলে পতি নিন্দা সে আর শুনবে না বলেই দেহত্যাগ করেছিল। সেই সংস্কার এখানে শকুন্তলার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। “পতি

নিন্দা শোনা পাপ'—এই ধারণা থাকার জন্যেই শকুন্তলা তাঁর বিরহ বেদনা ব্যক্ত করতে পারছেন না। তাঁর বিরহ ব্যথা যতই তাঁকে আচ্ছন্ন করছে ততই তিনি দেখতে পাচ্ছেন আশ্রম জুড়ে ছড়িয়ে থাকা তাঁর স্বামীর তাঁর প্রেমের নানা নিদর্শন।

একদিকে বিরহব্যথা, অন্যদিকে স্বামীর কল্যাণ কামনা এই দোলাচলে পড়ে শকুন্তলার আহারে রুচি নেই, চোখে নিদ্রা নেই এবং মাঝে মাঝে তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। চেতনা ফিরে পেলেই দেখেন সামনে দুষ্মন্তের মূর্তি। দুহাত বাড়িয়ে স্বামীর চরণযুগল বেষ্টন করার জন্যে ছুটে যায়। তখনি ভুল ভাঙে, কান্নাই সার হয়।
মাঝে মাঝে শকুন্তলা স্বপ্নে দেখেন দুষ্মন্তর রাজপ্রাসাদ, রাজৈশ্বর্যের -

"স্বর্ণ-রত্ন সংঘটিত দেখি অট্টালিকা
দ্বিরদ-রদ-নির্মিত দুয়ারে দুয়ারী
দ্বিরদ; সুবর্ণাসন দেখি স্থানে স্থানে;
ফুলশয্যা, বিদ্যাধরী-গঞ্জিনী কিঙ্করী
কেহ গায়, কেহ নাচে যোগায় আনিয়া
বিবিধ ভূষণ কেহ; কেহ উপাদেয়
রাজভোগ। দেখি মুক্তা মণি রাশি রাশি,
অলকা-সদনে যেন।"

স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় শকুগুলার অবস্থা দুষ্মপ্তময়। মুষ্ছিতা হয়ে সংজ্ঞা প্রাপ্তির পর যেমন তিনি দুষ্মন্তকে দেখছেন। যদি ঘুম আসে তাহলে স্বপ্নেও তিনি দুষ্মন্তর ঐশ্বর্য দেখছেন, দুষ্মন্তকে দেখছেন—

"তোমায়, নৃমণি, দেখি স্বর্ণ সিংহাসনে।
শিরোপরি রাজছত্র; রাজদন্ড হাতে,
মণ্ডিত অমূল্য রত্নে: সসাগরা ধরা,
রাজকর করে, নত রাজীব-চরণে।"

শয়নে স্বপনে জাগরণে শকুন্তলার দুষ্মন্ত চিন্তাই এর একমাত্র ফল। কিন্তু স্বামীর দেবেন্দ্র-সদৃশ ঐশ্বর্য থাকলেও শকুন্তলার মনে সে বিষয়ে কোন লোভ নেই——নাহি লোভে দাসী বিভব।' তিনি কেবলমাত্র দাসী রূপে স্বামীর চরণ সেবা করে ধন্য হতে চান। তাই তাঁর প্রার্থনা 'কিঙ্করী করিয়া মোরে রাখ রাজপদে"।

শ্রকুন্তলার ঐশ্বর্য লোভ বা বাসনা যেমন নেই, তেমনি প্রোষিতভর্তৃকা ও বিরহ দশার জন্যেও অপর কোন ব্যক্তির ওপর তাঁর ক্রোধ না ক্ষোভ নেই। তিনি অদৃষ্টবাদী তার ধারণা এ সবই তাঁর ললাট লিখন। তার বক্তব্য—

"চির অভাগিনী আমি! জনক-জননী

ত্যজিলা শৈশবে মোরে, না জানি, কি পাপে?
এ নব যৌবনে এবে ত্যজিলা কি তুমি,
প্রাণপতি?

অদৃষ্টবাদীরা যে রূপ নানা শংকায় শংকিত হয় শকুন্তলাও তেমনি শংকিত। তাঁর আশংকা, যে ঋষিবালকের হাত দিয়ে এই পত্র তিনি দুষ্মন্ত সমীপে প্রেরণ করছেন, তার পক্ষে রাজপুরীতে প্রবেশ করা সম্ভবপর কিনা। যদি সে প্রবেশ করে তবে রাজার হাতে এ পত্র সে দিতে পারবে কিনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও শকুন্তলা আশা ছাড়তে নারাজ। এখানেই শকুন্তলার চারিত্রিক দৃঢ়তা ফুটে উঠেছে। তাঁর জীবন কাহিনী করুণ রসে পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ট্র্যাজেডি তাকে স্পর্শ করতে পারে নি। শোক দুঃখ পেয়েও শকুন্তলা আপন কর্তব্যে অবিচল থাকতে পেরেছেন এবং শত দুঃখ বঞ্চনার পরেও রাজাকে তিনি তাঁর আশার কথা জানিয়ে লিখেছেন—

"কিন্তু মজ্জমান জন, শুনিয়াছি ধরে
তৃণে, আর কিছু যদি না পায় সম্মুখে
জীবনের আশা, হায়, কে তাজে সহজে।"

মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম অবলম্বনে মধুসূদন নাট্য-লক্ষণাক্রান্ত এই পত্রিকাটি রচনা করেছেন। কিন্তু মহাকবিকে তিনি হুবহু অনুকরণ করেন নি। ফলে তাঁর শকুন্তলা চরিত্রে ও কাহিনীতে কিছু কিছু পার্থক্য ও মৌলিকতা লক্ষিত হয়।

মহাকবির শকুন্তলা নিজ বিরহের কথা পদ্মপাতায় রচনা করেছিলেন তাঁর সখীদ্বয়ের সহায়তায় কিন্তু মধু কবির শকুন্তলা তাঁর বিরহ কাতরতা সখীদের কাছে গোপন করে রাখার জন্যে স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়ে পত্র লিখেছেন। বীরাঙ্গনা শকুন্তলা বিরহে কাতর হলেও দিশেহারা হন নি বা আত্মমগ্নতায় নিমজ্জিত হলেও পতিকল্যাণ কামনাকেই মুখ্য ব্রত হিসেবে সামনে রেখেছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলার দুষ্মন্ত চিন্তায় জগৎ ও কর্তব্য বিস্মরণ করেছিলেন বলেই দুর্বাশার অভিশাপ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের শকুন্তলা জগৎবিস্মৃত হন নি বলেই দুর্বাশা প্রসঙ্গ এখানে স্থান পায় নি। এই সমস্ত নানা পার্থক্য উভয় কবির শকুন্তলার মধ্যে বিদ্যমান।

বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রথম সর্গে শকুন্তলার যে চরিত্র চিত্রিত হয়েছে তা সংক্ষেপে এই রূপ— তিনি নম্র, বালিকা স্বভাবযুক্তা আশ্রমবন্যা। তিনি অদৃষ্টবাদী। ভালো মন্দ ফলপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে তিনি দৈবনির্ভর। স্বামীর কল্যাণ কামনাই তাঁর জীবনের মূল ব্রত। তিনি উচ্চকণ্ঠী নন, যাবতীয় কোমল চিত্তবৃত্তিযুক্ত তার অন্তর করুণায় মথিত। তিনি হিংসাদ্বেষ অসূয়ালেশহীন ক্ষমাশীলা নারী। তিনি আশাবাদী। তাঁর একমাত্র আশা দুঃখ দুর্ভাগ্য অপনোদিত হয়ে অবশেষে তিনি তাঁর পতির চরণে আশ্রয় লাভ করবেন।

7.বীরাঙ্গনা কাব্যের কেকয়ী পত্রিকার কেকয়ী চরিত্রটি বর্ণনা কর | বীরাঙ্গনা কাব্যের কেকয়ী স্বার্থের নয় সত্যের পূজারী আলোচনা কর।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রাচীন সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করে নতুন যুগের উপযোগী কাহিনী নির্মাণ করে বাংলা সাহিত্য জগতে নবত্ব দান করে গেছেন। তাঁর সেই প্রদত্ত নবত্ব পরবর্তীকালে অপরাপর কবি সাহিত্যকের হাত ধরে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ছন্দ ভাষায় যেমন কবি মধুসূদন নতুনের আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। তেমনি রচনা রীতির ক্ষেত্রেও বাংলায় নতুন ভাবধারার প্রবর্তন করেন। তাঁর বীরাঙ্গনা কাব্য এমনই এক অদ্ভুত সৃষ্টি যার মধ্যে তাঁর নতুন ভাবনা চিন্তা, নতুন ধারা প্রচলন এবং আত্মসৃষ্টির সংস্কার ও সংশোধন মানসিকতার প্রতিবিম্বন ঘটেছে। বীরাঙ্গনা কাব্য পত্র-কাব্য এবং সম্ভবত বাংলা সাহিত্যে একমাত্র পত্রকাব্য। বাংলায় পত্রোপন্যাস হাল আমলের সাহিত্যেও নজরে পড়ে কিন্তু পত্রকাব্য আর দৃষ্টিগোচর হয় না। খুব সম্ভব এই একটি মাত্র পত্র কাব্যই বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল।

বিভিন্ন এগারোজন পৌরাণিক নায়িকার তাঁর প্রেমাস্পদ অথবা স্বামীর উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রের সমবায়ে সৃষ্ট বীরাঙ্গনা কাব্য রোমক কবি ওভিদের দি হিরোইদেস-এর আদর্শে প্রাণিত। তাই বলে হবহু ওভিদ-অনুকরণ কবি করেন নি। প্রয়োজনে রচনা আদর্শকে গ্রহণ, বর্জন এবং সংস্কার সাধন করে নিয়েছেন কবি। ফলে বিদেশী আদর্শ সঞ্জাত হলেও প্রাচ্য ভাবধারার মুখ্যতা এখানে লক্ষ্য করা যায়। আবার মহাকাব্য থেকে উপাদান সংগৃহীত হলেও তার ঘটনাকে হুবহু অনুসরণ না করে প্রয়োজনে কিছু গ্রহণ বর্জন ও সংস্কার করে নিয়েছেন কবি। ফলে পুরাণ, মহাকাব্য ও প্রাচীন সাহিত্য থেকে বীরাঙ্গনা কাব্যের চরিত্র ও কাহিনীর উপাদান চয়ন করলেও বীরাঙ্গনা কাব্য হয়ে উঠেছে কবির মৌলিক সৃষ্টি।

বীরাঙ্গনা কাব্যের অনুযোগ পত্রের লেখিকা কেকয়ীও মধুসূদনের নতুন সৃষ্টি। রামায়ণের কেকয়ীর সঙ্গে মধুসূদনের কেকয়ীর মিল ও অমিল দুই-ই বর্তমান। বীরাঙ্গনার কেকয়ী স্বার্থবাদী। তাঁর স্বার্থ তার পুত্র ভরতের যৌবরাজ্য লাভ। যৌবনে কোন একদিন রাজা দশরথ কেকয়ীর সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে ভরতকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করবেন বলেছিলেন। কিন্তু কার্যকালে তিনি জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করলে, কেকয়ী ক্ষুব্ধ হন এবং অনুযোগসহ দশরথকে পত্র প্রেরণ করেন যে পত্রে তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

কেকয়ী পতি পরায়ণ, তিনি জানেন তার স্বামী অনূত্র ভাষণ করেন না। তাই দাসী মন্থরার মুখে যখন তিনি রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হওয়ার কথা শুনলেন তখন প্রথমে বিশ্বাস করতে পারেন নি। অবাক বিস্ময়ে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, “একি কথা শুনি আজ মন্থরার মুখে?”। ও কৌতূহলের সঙ্গে তিনি সমস্ত রাজ্য জুড়ে আনন্দ উৎসবের কারণ জানতে চেয়েছেন এবং ক্রমে তাঁর সংক্ষুব্ধ হৃদয়ের উত্তাপ ছড়িয়ে পড়েছে ব্যঙ্গ বিদ্রূপাকারে পত্রের ছত্রে ছত্রে। এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপ তাঁর অন্তরের প্রদাহকে উৎসারিত করে দিয়েছে।

বস্তুত রামায়ণের কেকয়ীর তুলনায় বিচার করে দেখলে মধুসূদনের কেকয়ী অনেক বেশি জীবন্ত বলে মনে হয়। রামায়ণের কেকয়ী ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু রাজা দশরথের ওপর সে ক্রোধ বর্ষণের রূপ থেকে তাঁর চরিত্র চিত্র অঙ্কন করা যায় নি। কেননা সে ক্রোধ ক্রোধাগারেই আবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখানে তা কেকয়ীকে নতুন করে তুলে ধরেছে আমাদের সামনে। যা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় কেকয়ী অভিমানী নায়িকামাত্র নন, দৃপ্ত তেজে তিনি প্রকৃতই বীরাঙ্গনা।

কেকয়ীর আচরণে বিশেষভাবে নজর করে দেখলে তাঁকে নিতান্ত স্বার্থবাদী বলে মনে হয় না। তিনি পুত্র ভরতের সিংহাসনপ্রাপ্তির জন্যে লড়াই করেছেন বটে। কিন্তু তাঁর পত্রে তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে রাজা দশরথের সত্যরক্ষার দাবী। ধর্মের দাবী। রঘুকুলপতির সত্য রক্ষা ও ধর্মপালনে অবহেলা তিনি প্রিয়তমা মহিষী হয়ে তা সহ্য করবেন কিরূপে? তাই সত্যরক্ষা ও ধর্মপালনের জন্যে রাজাকে তিনি নানাভাবে প্ররচিত করেছেন এবং প্রয়োজনে কটাক্ষবাণে বিদ্ধ করেছেন।

সপত্নীর প্রতি ঈর্ষাবশত কেকয়ী তাঁর প্রৌঢ়ত্বে দেহের যৌবন ভার ভেঙে পড়ার ইঙ্গিত করে দশরথকে কামুক বলে অভিহিত করে, বিদ্রূপের খোঁচায় তাঁকে ধর্মাচরণে ও সত্যপালনে ব্রতী করতে চেয়েছেন। আঘাত করে অচেতনতা বা বিস্মরণকে স্মরণ করাতে চেয়েছেন। কেন না কেকয়ী ন্যায় বিচার চান এবং তিনি বলেছেন, রাজার কাজই ন্যায় বিচারের। সেই রাজাই যদি অন্যায় করতে থাকেন তা হলে তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিণী, প্রিয়তমা মহিষীর একমাত্র কর্তব্য হল রাজা বা স্বামীকে ন্যায়ের পথে চালিত করা। সেই কাজ করতেই কেকয়ী কঠিন বিচারকের ভূমিকা নিয়েছেন।

ভরতের পরিবর্তে জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম রাজা হলে কেকয়ী ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হয়েছেন ঠিকই কিন্তু বীরাঙ্গনার কেকয়ী তার চেয়ে বেশি ব্যথিত হয়েছে রাজা দশরথের অধর্মাচরণে। তিনি তার স্বামীর কাছে স্বজ্ঞানে সে অপ্রিয় সত্য নিবেদন করতে গিয়ে বলেছেন, স্বামী গুরুজন না হলে তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলতেন -

“অসত্য-বাদী রঘু-কুল-পতি।
নির্লজ্জ। প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে!
ধর্ম-শব্দ মুখে, গতি অধর্মের পথে।”

স্বার্থ-বিঘ্ন চিন্তার বশবর্তী হয়েই যে কেকয়ী ক্রুদ্ধ হয়েছেন এমন নয়। তিনি প্রথমে যত্ন সহকারে রাজাকে পূর্ব কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছেন। এখানে স্বার্থের চেয়েও রাজার সত্যের অপলাপ ঘটনে কেকয়ী ক্ষুব্ধ, দুঃখিত। কেন না স্বামীর অধর্মাচরণ তাঁর মতো ক্ষত্রিয় নারীর পক্ষে পীড়াদায়ক। তাই পূর্ব কথা স্মরণ করিয়ে যখন মনে হয়েছে, এতে হয়তো কাজ হবে না। তখন তিনি রাজাকে ভয় দেখিয়েছেন যে, দেশে দেশে তিনি রটিয়ে বেড়াবেন, ‘পরম অধর্মাচারী রঘু-কুল-পতি, একথা তিনি নানা ভাবে রটাবেন। শুক-সারী পাখি পুষে তাদের একথা শিখিয়ে বনে উড়িয়ে দেবেন। তারা গাছের ডালে ডালে বসে ঐ বুলি বলবে। গ্রামের বালকদের শেখাবেন, খেলার ছলে গান গেয়ে তারা ঐ কথা বলবে এবং তাঁর মাতা কৌশল্যার বিরুদ্ধে কুকথা উচ্চারণ করেছেন। অন্তত অত্যন্ত বিরক্ত হয়েও যাতে রাজা ধর্মসাক্ষী করে যে সত্য কেকয়ীর কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন, সে সত্য পালন করেন এবং অবশেষে মরিয়া হয়ে ধর্মের দোহাই দিয়ে রাজাকে সতর্ক করেছেন –

“থাকে যদি ধর্ম, তুমি অবশ্য ভুঞ্জিবে
এ কর্মের প্রতিফল! দিয়া আশা মোরে
নিরাশ করিলে আজি; দেখিব নয়নে
তব আশা-বৃক্ষে ফলে কি ফল নৃমণি?”

এরপরে সাধারণ স্ত্রীর মতোই তিনি পতিগৃহ ত্যাগ করে পিত্রালয়ে যাবেন এবং পুত্র ভরতকেও সঙ্গে নিয়ে যাবেন একথা জানিয়ে দশরথের বুকে শেল বিধিয়ে কাজ হাসিল করার চেষ্টা করেছেন।

মধুসূদনের কেকয়ী সব মিলিয়ে এক অভিনব অনবদ্য চরিত্র। তাঁর একদিকে যেমন আছে স্বার্থগন্ধী মনোভাব, অন্যদিকে তেমনি পাওয়া যায় সত্য ভাষণে দৃপ্ত তেজস্বীতা এবং স্বামীর সত্য রক্ষার প্রতি আপ্রাণ প্রচেষ্টা। স্বামীর প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে ঠিকই কিন্তু স্বামীর অধর্মাচরণকে তিনি কোন মতে মেনে নিতে পারেন না। তাই মোহগ্রস্থের মোহভঙ্গের জন্যে তিনি আঘাতের পর আঘাত করেছেন। এমন কি রামায়ণের যে কেকয়ী রামচন্দ্রের গুণকীর্তন করেছিলেন, ন্যায়ের দরবারে ন্যায়বিচার প্রার্থী মধুসূদনের কেকয়ী সেই রামেরই নিন্দা করেছেন। এর মধ্যে তাঁর স্বার্থচিত্তা বড় হয়ে উঠলেও তিনি যে প্রকৃতই সুবিচারের দাবীতে এ ধরনের আচরণ করেছেন তার অনন্যতা অনস্বীকার্য। তবু একথা বলতে দ্বিধা নেই যে মধুসুদনের মৌলিক সৃষ্টি বীরাঙ্গনা কেকয়ী অতিমাত্রায় রুক্ষ চরিত্ররূপে চিত্রিত হয়েছে। তাঁর অগ্নিস্রাবী ভাষার প্রাবল্যে কেকয়ীর নারী সুলভ কোমলতা চাপা পড়ে গেছে। তবু তাঁর সতী সাধ্বী, পতি কল্যাণকামী মানসিকতার পরিচয় অটুটই থেকে গেছে।

৪.নীলধ্বজের প্রতি জনা পত্রিকা অবলম্বনে জনার চরিত্র | জনা কীভাবে ট্র্যাজিক চরিত্র হয়ে উঠেছে, জনার বীরত্ব ও ব্যক্তিত্ব জনার পত্রিকায় কীভাবে প্রকাশিত

নীলধ্বজের প্রতি জনা পত্রটির উৎস কাশীরাম দাসের মহাভারত। সেখানে আছে মাতিস্মতী রাজ নীলধ্বজের স্ত্রী জনার কথা। গঙ্গা ভক্ত জনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে প্রবীর। পাণ্ডবদের অশ্বমেধের ঘোড়া পুত্র প্রবীর বন্দি করেছিল। কৃষ্ণ ভক্তক নীলধ্বজ সেই ঘোড়া ফিরিয়ে দিতে বললে পুত্র প্রবীর ফেরৎ না দিয়ে মাতা জনার অনুপ্রেরণায় অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করে। যুদ্ধে প্রবীর মৃত্যুবরণ করে। তখন স্বয়ং জনা যুদ্ধে অগ্রসর হলে কৃষ্ণের কৌশলে পাণ্ডবরা রক্ষা পায়। পুত্রাশোকে অধীর হয়ে জনা গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয়।

মধুসূদন জনার এই কাহিনিকে অবলম্বন করেছেন তার পত্রে। গঙ্গাবক্ষে ঝাঁপ দিয়ে সমস্ত জ্বালা জুড়াবার পূর্ব মুহূর্তের পত্র এটি। অর্জুনের ওপর রাগ স্বামীর প্রতি অভিমান এবং পুত্র প্রবীরের প্রতি প্রকাশিত হয়েছে বাৎসল্য। স্বামীর প্রতি দোষারোপ করা যে পাপ সে কথাও উল্লেখ করেছেন স্বামীর প্রতি গভীর ভালোবাসা থেকেই।

জনা পত্রিকার ছত্রে মর্ম পীড়িত নারী হৃদয়ের জ্বালা ও অভিমান ফুটে উঠেছে। পুত্রের মৃত্যুতে জনার বিলাসে পুত্র শোকাতুরা জননীর বিলাপ অশ্রু নেই–আছে শুধু অগ্নিময়ী প্রবাহ । কাব্যোৎকর্ষের বিচারে এই পত্রিকাটি সর্বাঙ্গ সুন্দর এবং আবেদন মর্মভেদী। অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধে পুত্র প্রবীর নিহত হওয়ার সত্ত্বেও রাজা নীলাধ্বজ ক্ষত্রধর্ম বিস্তৃত হয়ে সেই অর্জুনের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করে হস্তিনাপুরে যেতে চাইছেন। রাজপুরীতে বিশেষ সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করেছেন। স্বামীর বিসদৃশ আচরণে ব্যথিত জনার হৃদয়ে প্রতিশোধানল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠল। অর্জুন অন্যায় সমরে বালক প্রবীরকে নিহত করেছেন—কোথায় শত্রুর রক্তে শোক নির্বাপিত হবে তা না করে নীলধ্বজ অর্জুনের মনোরঞ্জনের জন্য রাজসভায় নৃত্য গীতাদির আয়োজন করেছেন।

গঞ্জনায় তিরস্কারে জনা অর্জুনের অন্যায় যুদ্ধ ও চারিত্রিক দুর্বলতা কথা শুনিয়ে দিলেন স্বামীকে। তবুও সংশয় থাকায় জনা পুঞ্জীভূত ক্রোধে ফেটে পড়লেন তিনি। কুন্তী দ্রৌপদী ও ব্যাসদেব সহ অর্জুনের জন্ম ও চরিত্রগত কলঙ্কের দিকে আঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন—

‘নব নারায়ণ পার্থ! কুলটা যে নারী
বেশ্যাগর্ভে তার কি হে জন্মিলা আসি।

প্রবীরের মৃত্যুতে নীলধ্বজ উদাসীন। জনা পুত্রশোকে অধীর। কিন্তু তার চেয়েও বেশি অধীর হয়েছেন স্বামীর আচরণে। জনার মধ্যে স্বাধীন চিন্তাশক্তির প্রকাশ ঘটতে আমরা দেখি। প্রচলিত ও সর্বজন স্বীকৃত মতামতকে নির্দ্বিধায় মেনে নেননি তিনি। ঊনবিংশ শতাব্দীর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবোধ আত্মমর্যাদা এবং যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ ধর্মী প্রবণতা দেখা যায় জনা চরিত্রে। পাণ্ডবদের সর্বস্বীকৃত দেবত্বে তিনি অবিশ্বাসী, ব্যাসদেবও তাঁর তীক্ষ্ণ যুক্তিজালে জর্জরিত। অর্জুনের বীরত্ব খ্যাতির বিরুদ্ধেও জনার বক্তব্য যুক্তিযুক্ত—

ছদ্মবেশে লক্ষ রাজে দলিল দুর্মতি
স্বয়ম্বরে! যথা সাধ্য কে যুঝিল, কহ,
ব্রাহ্মণ ভাবিয়া তারে, কোনো ক্ষত্ররথী,
সে সংগ্রামে? রাজদলে তেঁই সে জিতিল।

এছাড়া কৃষ্ণের সাহায্যে খান্ডব দহন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে শিখন্ডী সাহায্যে ভীষ্ম নিধন, অন্যায় যুদ্ধে কর্ণবধ প্রভৃতি যুদ্ধ কি নীতিসম্মত। "কহ মোরে শুনি মহারথী প্রথা কি হে এই মহারথী?"

তেজস্বিনী ক্ষাত্রধর্মের দৃপ্ত প্রতিমা জনা। পুত্রশোকে তাঁর অন্তর বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে—তাই শোকে স্বামী নীলধ্বজকে জনা প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উত্তেজিত করেছেন।

কিন্তু ক্ষাত্রধর্মের উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ জনা ক্ষোভে লজ্জায় ঘৃণায় আহত সর্পিণীর মতো গর্জন করে উঠলেন—

'কি লজ্জা! দুঃখের কথা হায় কব কারে?'

স্বামী কৃষ্ণের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ভক্তির পথে চলেছেন আর জনা চলেছেন বীরের পথে।
বিদ্রোহিণী জনা জানেন স্বামীর কাজ ক্ষাত্রধর্মী বিরোধী। পতি পরায়ণা স্ত্রী তাই রাজপুর তথা পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। অধর্ম ও অকর্তব্য থেকে স্বামীকে উদ্বার করতে পারেননি। তাঁর নিরুদ্ধ অশ্রুর মধ্যে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়েছে—

'ফিরি যবে রাজপুরে প্রবেশিবে আসি,
নরেশ্বর, 'কোথা জনা?' বলি ডাক যদি
উত্তরিবে প্রতিধ্বনি 'কোথা জনা?' বলি।"

জনা কিন্তু কেকেয়ীর মতো স্বামীকে অপমানিত করেননি। কেবল দুঃখে ও মর্মবেদনার জ্বালায় হাহাকার করেছেন। স্বামীর প্রতি ভক্তি ছিল জনার আন্তরিকা। তাই স্বামী ভক্ত জনা বলেন—

“গুরুজন তুমি
পড়িব বিষম পাপে গঞ্জিলে তোমারে।”

এখানে মধুকবির নৈপুণ্যের তুলনা নেই। জনার একটি উচ্চাঙ্গের বীরাঙ্গনা রূপ এ পত্রিকায় গাঢ় উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত হলেও তাঁর নারী রূপ যেন সাম্যক বিকশিত হয়নি। কিন্তু পত্রের শেষ অংশে চমৎকার নাটকীয় উপসংহারে চরিত্রটি অপরূপ হয়ে উঠেছে। এখানে আমাদের মনে পড়ে যায়, জনা, চিরন্তন ভারতীয় নারী স্বামীর চরণে বিদায় প্রার্থনা না করে মহাযাত্রায় যেতে পারেন না তিনি। তিনি অভিমানবশে প্রাণ বিসর্জনের জন্য রাজপুরী ত্যাগ করছেন বটে, কিন্তু স্বামীর জন্য তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। শূন্য ঘরে ‘কোথা জনা' বলে ডেকে রাজা যখন কেবল প্রতিধ্বনিই শুনতে পারেন, স্বামীর তখন কার সেই মর্মবেদনা অনুমান করে এই নারী অশ্রু সম্বরণ করতে পারছেন না—এইখানেই জনার এই এক চিরন্তন সকরুণ নারী রূপ পাঠকের মানসপটে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

জনা মধুসূদনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজিক চরিত্র। তিনি নিজে অন্তরে বাহিরে সার্থক ক্ষত্রিয় রমণী। তিনি স্বহস্তে তার পুত্রকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়েছিলেন অথচ অর্জুনের হাতে অন্যায়ভাবে মৃত্যু ঘটেছে তাঁর প্রাণ প্রিয় পুত্রের। পুত্রশোকের সেই নিদারুণ শোকাঘাত তো ছিলই তাতে ইন্ধন জোগাল তাঁর স্বামীর কাপুরুষোচিত আচরণ। চরিত্রটি ট্র্যাজিক হবার এই-ই কারণ। যে মুহূর্তে জনাকে স্বামীর বীরুদ্ধে অগ্নিশিখার মতো জ্বলে উঠে প্রতিবাদ করতে হবে, তখনই অন্তর থেকে আসছে তাঁর নারীধর্মের অনুশাসন—‘পড়িব বিষম পালে গঞ্জিনে তোমাতে।' কারণ তাঁর স্বামী ‘গুরুজন’। এই দ্বন্দ্বের ওপরই জনার ট্র্যাজেডি গড়ে উঠেছে। আরও একটু গভীরভাবে বললে বলা যেতে পারে জনার অন্তরের আসল কথাটি হল আত্মমর্যাদাবোধ। এই বোধকে আশ্রয় করেই তার অন্যান্য চারিত্রিক গুণগুলি বিকশিত হয়ে উঠেছে। একমাত্র পুত্র ক্ষত্রিয়ের মর্যাদার স্বার্থে অসমযুদ্ধে রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে বলেই জনার কাছে তা এতই আদরণীয়, গভীর শোকের সাথে আত্মসম্মানের মহৎ আদর্শ মিলিত হয়ে জনা চরিত্রে এই ট্র্যাজিক মহত্ব আরোপ করেছে।

পুত্রশোকে যে হৃদয় বিহ্বল হয়নি স্বামীর আচরণ তথা উপেক্ষা তা একেবারে ভেঙে পড়ল। পুত্রহীন জনার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন নীলধ্বজ। তিনিও যখন তাকে প্রত্যাখান করলেন তখন ঐহিক জীবনে জনার আর কোনো আসক্তি রইল না। তখন জনা উচ্চারণ করেছিলেন 'ছাড়িব এ পোড়া প্রাণ জাহ্নবীর জলে? পরিণত বয়সীর নারীর বেঁচে থাকার যে দুটি প্রধান অবলম্বন জননী ও পত্নীরূপে সে দুটিই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। পুত্র অন্যায়ে নিহত, স্বামী জীবিত থেকেও পর পদলেহনকারী আত্মগৌরব হানির গভীর দুঃখ এই পত্রে কারুণ্যের গভীর বেদনা বিস্তীর্ণ করে দিয়েছে।

৯.বীরাঙ্গনা কাব্যের শূর্পণখা পত্রিকা অবলম্বনে শূর্পণখার চরিত্র বর্ণনা করো।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দকে আশ্রয় করে বাংলা কাব্যসাহিত্যে এক অভূতপূর্ব ধারা সৃষ্টি করেছেন পত্রকাব্যের। এ ধরনের পত্রকাব্য বাংলা সাহিত্যে আর নজরে পড়ে না। তবে গদ্যে রচিত পত্রোপন্যাস রচনা করেছেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম এবং আধুনিক সাহিত্যের কোনো কোনো ঔপন্যাসিক। কিন্তু 'বীরাঙ্গনা কাব্য তুল্য পত্রকাব্য অধুনাকাল পর্যন্ত 'একমেবদ্বিতীয়ম্'।

যুগন্ধর কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত পুরাণ ও মাহাকাব্য থেকে এগারোজন অঙ্গনাকে বেছে নিয়ে, তাদের মনোভাবাশ্রয় করে পত্র রচনা করেছেন তাদের প্রেমিক বা স্বামীর উদ্দেশ্যে। রচনা কৌশলে মনে হয় যেন ওই এগারোজন নায়িকা তাঁদের প্রেমিকদের উদ্দেশ্যে আপন মনোভাব জ্ঞাপন করে নিজেরাই পত্র রচনা করেছেন। পত্রগুলির মধ্যে প্রতিটি নায়িকার চরিত্র, স্বভাব, ব্যক্তিত্ব, মনোভাব, ইচ্ছা, অনিচ্ছা চমৎকার ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এবং একই ধারায় একই মনগত বাসনা প্রকাশী পত্র হলেও, প্রতিটি পত্রের মধ্যেই স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান।

কবি বীরাঙ্গনা কাব্য রচনায় পৌরাণিক উপাদান ব্যবহার করেছেন তিনটি উপায়ে। (১) পৌরাণিক কাহিনীর অনুসরণ, (২) প্রয়োজনে সেই কাহিনী স্বেচ্ছামতো গ্রহণ বর্জন অথবা আমূল পরিবর্তন এবং (৩) পৌরাণিক পটভূমিতে রেমান্টিক আমেজ সৃষ্টি। মোটামুটিভাবে এই তিনটি ধারাতেই অনুবর্তিত হয়েছে বীরাঙ্গনা কাব্য এবং কাব্যের অঙ্গনাগণ।

বীরাঙ্গনা কাব্যের পঞ্চম সর্গে বর্ণিত শূর্পণখা পত্রিকার মধ্যেও কবির এই নবপুরাণ রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কবি এখানে শূর্পণখাকে এক প্রেমময়ী সুন্দরী যুবতী রূপে সৃষ্টি করেছেন। এই প্রসঙ্গে পত্রিকার ভূমিকায় তিনি পাঠকবর্গের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন, পাঠকবর্গ "বাল্মীকি বর্ণিতা বিকটা শূর্পণখাকে স্মরণ পথ হইতে দুরীস্কৃতা করিবেন"।

কবিগুরু বাল্মীকি তাঁর রামায়ণে রাজেন্দ্র রাবণের ভগিনী শূর্পণখাকে বীভৎস রসের আবহে সৃষ্টি করেছেন। রাক্ষস রাজার ভগ্নী রাক্ষসী হবেন এতে আর আশ্চর্যের কি! কিন্তু সেই রাক্ষসীর মধ্যে যখন প্রেমের সঞ্চার হতে পেরেছে তখন তাকে আমাদের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত মানবী ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন নি। তাই শূর্পণখা তাঁর লেখনীর মাধুর্যে সুন্দরী যুবতী রূপে বর্ণিতা হয়েছেন। এর আগে বাংলা সাহিত্যের অমরসৃষ্টি মেঘনাদবধ কাব্যেও রাক্ষস-রাজ ও তাঁর পরিবার সকলেই মানুষোচিত মহিমায় বর্ণিত হয়েছেন। তাদের তমঃ ভাব বীরেশ্বর্যে ভূষিত হয়েছিল।

এখানেও সেই রকম শূর্পণখা প্রেমময়ী আর পাঁচজন সুন্দরী হৃদয়বতীর মতোই নিজেকে উজাড় করে দয়িতের উদ্দেশ্যে প্রেম নিবেদন করে তৃপ্ত হতে চান।

বীরাঙ্গনা কাব্যের শূর্পণখা বাল্যবিধবা। পঞ্চবটী বনে যখন রামচন্দ্র ও সীতার সঙ্গে লক্ষ্মণ বনবাসের কাল যাপন করছেন—কঠোর কৃচ্ছসাধনে, সেই সময় বাল্যবিধবা যুবতী শূপণখার মনে লক্ষ্মণকে দেখে প্রেমের সঞ্চার হয়। লক্ষ্মণের তরুণ যৌবনের অনিন্দ্য সৌন্দর্য তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করে। তিনি লক্ষ্য করেন রামচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর মানসদোসর সীতা রয়েছেন, কিন্তু লক্ষ্মণ একা। তাঁর মনে হয়েছে লক্ষ্মণ অবিবাহিত বলেই একা। তাই এই ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির প্রতি তাঁর মন আকর্ষিত হয়েছে এবং সঙ্গত ভাবেই তিনি প্রেম নিবেদন করে লক্ষ্মণের কাছে পত্র প্রেরণ করেছেন।

পত্রিকার মধ্যে অনুরাগের সঙ্গে সঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে শূর্পণখার স্বভাব চরিত্রও। শূর্পণখা কোমল চিত্তবৃত্তিধারী। তাই অনিন্দকান্তি লক্ষ্মণের কৃচ্ছসাধন দেখে তাঁর কষ্ট হয়। সে কথা পত্রের প্রথমেই তিনি জানিয়েছেন—'ফাটে বুক জটাজুট হেরি তব শিরে'। এবং এই বুক ফাটা শুধু কথার কথা নয়। ভালোবাসার পাত্রের দুর্বিসহ কষ্টের জন্যে তিনি তাঁর স্বর্ণশয্যায় শুতে পারেন না, রাজভোগ খেতে কষ্ট হয়, কারণ মনে পড়ে যায় তাঁর প্রিয়তম কেবল শুকনো ফলমূলমাত্র আহার করে জীবন ধারণ করছেন। এমনকি স্বগৃহে যেতেও তাঁর গতি মন্থর হয়ে যায় কেন না স্বর্ণগৃহের রম্যভবনে তিনি অবস্থান করবেন অথচ লক্ষ্মণ থাকবে বনের মধ্যে পর্ণকুটিরে।

ব্যথিতা শূর্পণখা যে লক্ষ্মণকে সত্যিই ভালোবাসেন তা বোঝা যায় যখন তিনি লক্ষ্মণের সুখের জন্যে সমস্ত কিছু ত্যাগ করতে রাজি হয়ে যান। এমন কী প্রেমিকার পক্ষে উচ্চারণ করা কঠিন এমন অঙ্গীকার করতেও তিনি দ্বিধা করেন নি– “কহ শীঘ্র করি/ কোন্ যুবতীর নব যৌবনের মধু/বাঞ্ছা তব? অনিমেষে রূপ তার ধরি,/(কামরূপা আমি, নাথ) সেবিব তোমারে।” এই উক্তি থেকে লক্ষ্মণের প্রতি তাঁর প্রেমের গভীরতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি অন্যান্য নারীদের মতো প্রিয়তমের সুখের জন্যে বা প্রিয়তমের সঙ্গ কামনায় রাজসুখভোগ ত্যাগ করে শুধুমাত্র বাল্কলাবৃত শরীরে প্রিয়তমের অনুসরণ করতে পারেন তো বটেই সেই সঙ্গে, প্রিয়তমের মানসিক চাহিদা মেটানোর জন্যেও নিজেকে নিয়োজিত করতে পারেন।

পৌরাণিক কাহিনীতে ইতিপূর্বে দেখা গেছে, অগ্নিকে ভালোবেসে স্বাহা সপ্তর্ষির ছয় পত্নীর রূপ ধরে মিলিত হয়েছিলেন। এখানেও শূর্পণখা সেই রকম অন্যের রূপ ধারণ করে প্রিয়তমকে আনন্দ দিতে চান। কিন্তু তফাৎ এই যে, স্বাহা কেবলমাত্র নিজ অভীষ্ট পূরণ করার জন্যে অথবা প্রিয় মিলন

বাসনায় অগ্নিকে না জানিয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করে ছয় বার প্রিয়তমের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। কিন্তু শূর্পণখা প্রেমের ক্ষেত্রে নিজের চেয়ে লক্ষ্মণকে, লক্ষ্মণের আনন্দ বিধানকে গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি মাত্রায়।

প্রেমাস্পদের কাছে কিছুই তিনি গোপন রাখতে চান নি। এমন কি তাঁকে ভালোলাগা মন্দলাগার অধিকারও প্রেমাস্পদের ওপর ন্যস্ত করে প্রেমাস্পদের ইচ্ছাকেই বড় করে দেখতে চেয়েছেন। তাই আবেদনপূর্ণ পত্রে তিনি লিখেছেন।

“কি রূপ বিধাতা
দিয়াছেন, আশুআসি দেখ, নরমণি।
আইস মলয় রূপে; গন্ধহীন যদি
এ কুসুম, ফিরে তবে যাইও তখনি!”

এবং আত্মপরিচয় জানাতে গিয়ে, তিনি যে রাবণের ভগিনী, ঐশ্বর্য সুখে লালিতা একথা জানাতেও কুন্ঠিতা হন নি। তিনি সর্বপ্রকারে সহায়িকা রূপে লক্ষ্মণের কাছে নিজেকে তুলে ধরেছেন। 'দাসীভাবে সেবিবে এ-দাসী' বলে আবেদন জানালেও মনে তাঁর সংশয় রয়ে গেছে। কিন্তু সে সংশয় আনন্দে পরিপূর্ণ। কারণ রাক্ষস রাজার ভগ্নী কখনও প্রত্যাখ্যাত হয় নি। তাই যখন -

“আনন্দে বহিছে
অশ্রুধারা। লিখেছে কি বিধাতা এভালে
হেন সুখ প্রাণসখে?"

এই উক্তি শূর্পণখা করেন তখন তলে তলে তাঁর বিপুল অহংকারটাই প্রকট হয়ে পড়ে।

সমগ্র পত্রিকার বিচারে মধুসুদনের বীরাঙ্গনা কাব্যে শূর্পণখা দোষে গুলে মিশ্রিত একজন প্রেমময়ী যুবতীরূপেই চিত্রিত হয়েছেন। বাল্মীকির শূর্পণখার সঙ্গে তার আশমান জমিন পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।